আজ আমরা অমানবিক ঘটনার সাক্ষী

একটা সময় ছিল — চারপাশে নজর ফেললেই দেখা যেত সারি সারি কারখানা, অগুনতি কয়লার চিমনির ধোঁয়া। দিনের শুরুতে ও শেষে সাইরেনের শব্দ জানান দিত শিল্পাঞ্চলের কর্মচাঞ্চল্যে জেগে থাকা শ্রমিক — শ্রম ও উৎপাদনের ভরপুর অস্তিত্বকে। সেই সময়কে পেছনে রেখে এসে গেল এই সময় যখন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলের ভূগোলের দিকে তাকালে শুধুই নজরে পড়ে ঝোপঝাড় জঙ্গলে ভরা সারি সারি বন্ধ কারখানা। যে দুয়েকটা চালু কারখানা আছে তাও বন্ধের আশঙ্কায় শ্রমিকরা ভয়ঙ্কর আতঙ্কিত। ফলে কারণে-অকারণে তাঁরা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। বহু বছর ধরেই সরকারের কাছে জানতে চেয়েও এ প্রশ্নের উত্তর নেই যে কেন বহু বন্ধ বা রুগ্ন কারখানাই চাহিদা, বাজার সত্ত্বেও শেড্, মেশিন নিয়ে উৎপাদনহীন হয়ে পড়ে রয়েছে বা কবরখানায় পরিণত হচ্ছে।

এটা স্বীকৃত সত্য যে, কারখানা বন্ধের ফলে যে সংকটের জন্ম তা সাধারণভাবে শ্রমিকের বাঁচার সংকট সৃষ্টি করছে। সংবিধান প্রদত্ত যে বাঁচার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত সেই নাগরিক অধিকার খর্বিত হচ্ছে। সর্বস্তরের নাগরিকদের এ বিষয়ে সরব হওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করেই ১৯৮৯-এর ২১ সেপ্টেম্বর, আজ থেকে দশ বছর আগে নাগরিক মঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কোন পথে, কেমনভাবে বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের মোকাবিলা সম্ভব— এই অনুসন্ধান বিগত দিনগুলিতে করার চেষ্টা হয়েছে যা আজও চলছে।

সংস্থার জন্মলগ্ন থেকেই দাবী করে আসা হচ্ছিল বন্ধ কারখানার শ্রমিকের দক্ষতা বাঁচিয়ে রাখা এবং আত্মহত্যা, অনাহার জনিত মৃত্যু থেকে এই সব শ্রমিক ও তার পরিবারকে বাঁচাতে সরকার আর্থিক সাহায্য দিন। অনেক দেরীতে হলেও রাজ্য সরকার ১৯৯৮ বাজেটে বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের পাঁচশো টাকা করে মাসিক অর্থ সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন এবং এ পর্যন্ত ৯২ টি শিল্প ইউনিটের শ্রমিকরা এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আমরা সরকারি এই উদ্যোগকে সমর্থন জানাই। কিন্তু বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের পুনরুজ্জীবনে আরও যে ৫০ কোটি টাকার বাজেট সংস্থান রাখা হয়েছে, তার জন্যে সরকারি পর্যায়ে উপযুক্ত উদ্যোগ এখনও লক্ষ্যণীয়ভাবে অনুপস্থিত। সরকারি এক ঘোষণায় জানা যাচ্ছে বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণে সচিব পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাবেই বলা দরকার এই ধরণের সচিব পর্যায়ের আমলা-নির্ভর কমিটির কাছ থেকে কোনো সক্রিয় উদ্যোগ আশা করা সম্ভব নয়। অসংখ্য বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প এই রাজ্যে আছে, যার তালিকা অতীতে সরকারের কাছে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে বা আগামী দিনে প্রয়োজন হলে ও সরকারি উদ্যোগ থাকলে পাওয়া সম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা এই যে সরকারি পর্যায়ে এ সম্পর্কিত দায়বদ্ধ মন্ত্রী ও আমলা, সচিবরা দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করছেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে। কারখানা খোলার বিরুদ্ধ স্বার্থের হয়ে এরা সচেতন ভাবে কাজ করে চলেছেন। নানান অন্যায় অজুহাত সৃষ্টি করে কারণ অকারণে বাধাদান যেন এই সরকারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের মুখোমুখি প্রশ্ন করলে এরা মুখ লুকোবেন নিশ্চিত যে, পশ্চিমবঙ্গে বিগত বিশ বছরে কতগুলি রুগ্ন কারখানা সরকারি উদ্যোগে, সহায়তায় পুনরুজ্জীবিত হয়েছে? কতগুলি বন্ধ কারখানা নির্দিষ্টভাবে সরকারি উদ্যোগে ও সক্রিয়তায় খোলা সম্ভব হয়েছে? দায়প্রাপ্ত মন্ত্রীর মুখ বদলেছে তিনবার—কিন্তু সাফল্য খুবই সামান্য।

অনেককাল ধরেই এ রাজ্যে আমরা যেমন দেখছি যে কারখানা বন্ধ হয় মালিকের ইচ্ছায়—যদি বা খোলে তাও মালিকের মর্জিমাফিক। এ সম্পর্কিত বেআইনি কাজে ব্যবস্থা নেওয়ার অনেক আইন থাকলেও বা অজস্র শ্রমিক নেতা ও স্থায়িত্বশীলতার রেকর্ডধারী সরকার থাকলেও ভুক্তভোগী দুর্দশাগ্রস্থ শ্রমিক / কর্মচারির অভিজ্ঞতায় এদের প্রয়োজনীয় অস্তিত্ব নেই। শিল্পায়ন/বিনিয়োগ ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক প্রচারিত বিজ্ঞাপনে প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়, 'ঘুরে দাঁড়ানো'র অসাধ্য সাধনে 'শপথ' ব্যক্ত করছেন সরকার। অথচ 'ঘুরে দাঁড়ানো' সরকার একবারের জন্যও পেছন ফিরে তাকান না — অন্ততঃ সেই দিকে যেখানে শয়ে শয়ে বন্ধ বা রুগ্ন কারখানা জমি, শেড, মেশিন, দক্ষতা, বাজার, চাহিদা নিয়ে আজও অবস্থান করছে। আমরা মনে করি এবার এই সব বন্ধ ও রুগ্ন কারখানার যেগুলি চালু করা সম্ভব সেই সব ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারিদের বিকল্প প্রস্তাব অর্থাৎ শিল্প-সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালনা/অধিগ্রহণের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসা দরকার। এর পাশাপাশি সরকারের কাছেও আমাদের দাবী যে, তাঁরা বন্ধ ও রুগ্ন কারখানা খোলার বিষয়টিকে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করে একাজে সক্রিয় উদ্যোগ নিন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষজ্ঞ, শ্রমিক প্রতিনিধি এদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করার মধ্য দিয়ে দেখা প্রয়োজন কোন কারখানা কিভাবে খোলা সম্ভব,